১০-১১-১৮ প্রাতঃমুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সত্যকথার তীর তখনই লাগবে যখন হৃদয়ে সততা আর স্বচ্ছতা থাকবে । সত্যিকারের বাবার সঙ্গ পেয়েছ, তাই সৎ হও"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা হলে স্টুডেন্ট, কোন্ কথা তোমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখা উচিৎ ?

উত্তর :- কখনো কোনো ভুল হলে সত্য বলো, সত্যি বললেই উন্নতি হবে। তোমাদের নিজের সেবা অন্য কাউকে দিয়ে করানো উচিৎ নয়। যদি এখানে সেবা নেবে তো ওখানে করতে হবে। তোমরা হলে স্টুডেন্ট, ভালো করে পড়ে অন্যদের পড়াও তাহলে বাবা খুশী হবেন। বাবা প্রেমের সাগর, ওঁনার ভালোবাসা এমন যে বাচ্চাদের পড়িয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করান।

গীত :- কে এই সব খেলা রচনা করেছে .....

ওঁম্ শান্তি। আজকাল সমাচার আসে যে আমরা গীতা জয়ন্তী পালন করছি। এখন গীতার জন্ম কে দিয়েছে, এ সব হলো টপিক(বিষয়)। জয়ন্তী যখন বলা হয়েছে তখন জন্ম তো অবশ্যই হয়েছে তাই না ! একে বলা হয় শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা জয়ন্তী, তখন অবশ্যই তার জন্মদাতাও চাই, তাই না ! সকলে বলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ। তাহলে তো শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে আসে, গীতা পিছনে চলে যায়। তাহলে গীতার রচয়িতাকে তো অবশ্যই চাই। যদি শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় তাহলে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ, পরে গীতার আসা উচিৎ। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা, সে গীতা শোনাতে পারে না। এটা প্রমাণ করতে হবে যে গীতার জন্মদাতা কে? এ হোল অতি গূহ্য কথা। কৃষ্ণ তো মাতৃ-গর্ভ থেকে জন্ম নেয়, সে তো স্বয়ং প্রিন্সের পদ প্রাপ্ত করেছে গীতার দ্বারা রাজযোগ শিখে। এখন কথা হল গীতার জন্মদাতা কে? পরমপিতা পরমাত্মা শিব না শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণকে বাস্তবে ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী বলা যেতে পারে না। ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী একজনকেই বলা হয়। ত্রিলোকীনাথ অর্থাৎ তিন লোকের উপর রাজ্য করেন যিনি। মুল, সূক্ষ্ম, স্থূল- এই তিনটি-কে বলে ত্রিলোকী,আর একে যিনি জানেন তিনি হলেন ত্রিলোকীনাথ, ত্রিকালদর্শী পরমপিতা পরমাত্মা শিব। এই মহিমা ওঁনার, না কি শ্রীকৃষ্ণের। কৃষ্ণের মহিমাও আছে - ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সর্বগুণসম্পন্ন.....। শ্রীকৃষ্ণের তুলনা হয় চন্দ্রমার সাথে। পরমাত্মার তুলনা চন্দ্রমার সাথে করা যাবে না। ওঁনার কর্তব্যই আলাদা। তিনি হলেন গীতার জন্মদাতা, রচয়িতা। গীতার জ্ঞান বা রাজযোগ থেকেই দেবতারা তৈরী হয়। মানুষকে দেবতা বানানোর জন্য বাবাকে এসে নলেজ দিতে হয়। এখন এই জ্ঞান দেওয়ার জন্য বড় হুশিয়ার ব্রহ্মাকুমার-কুমারী চাই। সবাই একই রকমভাবে বুঝতে পারে না। বাচ্চারাও তো নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়। টপিকও এমন রাখা উচিৎ কি শ্রীমত ভগবত গীতার জন্ম কে দিয়েছে? এরজন্য কন্ট্রাস্ট(পার্থক্য) বোঝাতে হবে। ভগবান তো একজনই, পরমপিতা পরমাত্মা শিব। সেই জ্ঞানসাগরের থেকে জ্ঞান শুনে কৃষ্ণ এই পদ প্রাপ্ত করেছিল। সহজ রাজযোগ থেকে এই পদ কীভাবে পেয়েছে, তা বোঝাতে হবে। ব্রহ্মার দ্বারাই বাবা প্রথমে ব্রাহ্মণ রচনা করেন। সকল বেদ-শাস্ত্রের সার শোনান। ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রহ্মা মুখবংশাবলীও চাই। ব্রহ্মাই ত্রিকালদর্শীর জ্ঞান লাভ করে। ত্রিলোকী অর্থাৎ তিন লোকেরই জ্ঞান পায়। ত্রিকাল আদি,মধ্য,অন্তকে মিলিয়ে বলা হয় আর তিন লোক অর্থাৎ মুল, সূক্ষ্ম, স্থূলবতন। একথা স্মরণে রাখতে হবে। অনেক বাচ্চারা ভুলে যায়। ভুলিয়েছে দেহ অহংকার-রূপী মায়া। তাহলে গীতার রচয়িতা পরমপিতা পরমাত্মা শিব না কি শ্রীকৃষ্ণ। পরমপিতা পরমাত্মাই

ত্রিকালদর্শী তথা ত্রিলোকীনাথ। কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণের এই নলেজ নেই। হ্যাঁ, যারা এই নলেজ বাবার থেকে পেয়েছে তারা বিশ্বের মালিক হয়ে গেছে। যখন সদ্গতি পেয়ে যায় তখন এই নলেজ বুদ্ধি থেকে হারিয়ে যায়। সকলের সদ্গতি দাতা একমাত্র তিনিই। তিনি পুনর্জন্মে আসেন না। পুনর্জন্ম শুরু হয় সত্যযুগ ইত্যাদি থেকে। কলিযুগের অন্ত পর্যন্ত ৮৪ জন্ম নেয়, এই জ্ঞান ঠিক মতো বোঝাতে হবে। সবাই তো ৮৪ জন্ম নেবে না। যে এই গীতা লিখেছে তাকে ত্রিকালদর্শী বলা যাবে না। প্রথমেই লিখেছে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ। এ একদমই ভুল। ভুলও অবশ্যই হতে হবে। যখন সব শাস্ত্র ভুল হয়ে যায় তখনই তো বাবা এসে সঠিক জ্ঞান শোনাবে। সর্বদা ব্রহ্মার দ্বারা বেদ-শাস্ত্রের সত্য-সার শোনায় সেইজন্য তাঁকে সত্য বলা হয়। এখন তোমাদের হলো এক সত্যের সাথে সঙ্গ, যা তোমাদের সত্ বানায়।

প্রজাপিতা ব্রহ্মাও ওঁনার মুখবংশাবলী হলেন এই জগদম্বা সরস্বতী। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সব বাচ্চারাই পরস্পর ভাই-বোন। কোথাও মন্দিরে গিয়ে ভাষণ করা উচিৎ। ওখানে অনেকে ঘুরতে-ফিরতে আসে। একজনকে বোঝালেই সত্সঙ্গ লেগে যাবে। শ্মশানেও যাওয়া উচিৎ। সেখানে মানুষের বৈরাগ্য আসে। কিন্তু বাবা বলেন যে আমার ভক্তদের বোঝালে তারা ঝট করে বুঝে যাবে। তাই শিববাবার মন্দির, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যেতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে বাবা-মাম্মা বলা হয় না। শিবকে বাবা বলা হয় তাহলে মাম্মাও অবশ্যই চাই, তিনি হলেন গুপ্ত। শিববাবা হলেন রচয়িতা, তাঁকে মাতা-পিতা কীভাবে বলা হয়, এই গুপ্ত কথা কেউ জানতে পারে না। লক্ষ্মী-নারায়ণের তো নিজের একটাই সন্তান থাকবে। বাকী এঁনার নাম হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বিষ্ণু ও শংকর-কে উঁচুতে রাখা হয় না। উঁচুতে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মাকে রাখা হয়। যেমন শিব পরমাত্মাকে রচয়িতা বলা হয় তেমন-ই ব্রহ্মাকেও রচয়িতা বলা হয়। এক উনিই(শিব) হলেন অবিনাশী। যখন রচনা শব্দটি বলবে তখন জিজ্ঞাসা করবে, কীভাবে রচনা করেছেন? তিনি তো রচয়িতা। বাকী রচনা করা হয় ব্রহ্মার দ্বারা। এখন ব্রহ্মার দ্বারা পরমাত্মা সব আত্মাদের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ দেন। বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী। ভক্তিমার্গ আধাকল্প চলে, এ হলো জ্ঞান- কান্ড। যখন ভক্তিমার্গ সম্পূর্ণ হয় তখন সবাই পতিত, তমোপ্রধাণ হয়ে যায়, তখনই আমি আসি। প্রথমে সতোপ্রধান থেকে সতো, রজো, তমো-তে আসে। উপর থেকে যে সব পবিত্র আত্মারা আসে তারা এমন কোনো কর্ম করেনা যাতে তাদের দুঃখ ভোগ করতে হয়। ক্রাইস্টের উদ্দেশ্যে বলা হয় যে তাকে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয়েছিল, এটা তো হতে পারে না। নতুন আত্মারা যারা ধর্ম স্থাপন করতে আসে তারা তো দুঃখ পেতে পারে না, কারণ তারা তো কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত ম্যাসেঞ্জার(দুত), ধর্ম স্থাপন করতে আসে। লড়াইতেও যখন কোনো ম্যাসেঞ্জার পাঠানো হয় তখন সে শ্বেত-পতাকা নিয়ে আসে, তাতে অপরপক্ষ বুঝে যায় যে এ কোনো ম্যাসেজ(খবর) নিয়ে এসেছে, তাই তাকে কোনো কষ্ট দেওয়া হয় না। তাই ম্যাসেঞ্জার যিনি আসেন, তাকে কেউ ক্রুশ-বিদ্ধ করতে পারে না। দুঃখ আত্মাকেই ভোগ করতে হয়। আত্মা নির্লেপ (তাদের কোনো কালিমা লাগে না) নয়, একথা লেখা উচিৎ। আত্মাকে নির্লেপ বলা ভুল, একথা কে বলেছে? শিব ভগবানুবাচ। এই পয়েন্ট তোমাদের নোট করা উচিৎ। লেখার জন্য অনেক বিশাল বুদ্ধি চাই। মনে কর, প্রদর্শনীতে খ্রিস্টানরা এলে, তাদেরকেও বলতে পারো যে ক্রাইস্টের আত্মাকে ক্রুশে চড়ানো হয় নি। বাকী যার মধ্যে তিনি প্রবেশ করেছেন সেই আত্মা দুঃখ পায়। এমন কথা শুনে তো বিস্মিত হবে। ওই পবিত্র আত্মা এসে ধর্ম স্থাপন করেছে। গড ফাদারের ডায়রেকশন অনুসারে। এও ড্রামা। ড্রামাকেও অনেক লোক বোঝে কিন্তু তার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে না। এমন এমন কথা শুনে ওইসব লোকেরা কিছু বোঝার চেষ্টা করে। কৃষ্ণকে কেউ গালি দেয় না। গালি অবশ্যই দেওয়া

হয় কিন্তু কাকে? শিবকে নয়, এই সাকার-কে। বাবা তো টিচার, পবিত্র আত্মা আর ইনি (ব্রহ্মা বাবা) হলেন অপবিত্র, এখন পবিত্র হচ্ছেন । যে বুঝবে সে কোনো সংশয় প্রকাশ করবে না। আর তা নাহলে লোকেরা মনে করবে যে এ তো শেখানো বুলি(কথা)। তখন তা কেউ গ্রহণ করে না। তীর নিশানায় লাগে না। অনেক সততা আর স্বচ্ছতা চাই। যে নিজে বিকারী সে যদি বলে কাম মহাশত্রু তাহলে তীর সঠিক স্থানে লাগতে পারে না। যেমন পন্ডিতের উদাহরণ আছে - রাম-রাম বললেই নদী বা সাগর পার হয়ে যাবে(পন্ডিত নিজে পার হতে পারেনি, কিন্তু তার শিষ্যা বিশ্বাসের জোরে পার হয়ে যায়)। এ হোল এখানকারই কথা। শিববাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা এই বিষয় সাগর পার হয়ে যাবে। কোন সাগর? তা এই পন্ডিত জানে না। বেশ্যালয় থেকে শিবালয়ে চলে যাবে। অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। বলা হয় যে, বাবা হয় ভালোবাসো, আর না হয় দুরে ঠেলে দাও.....। এখানে তো শুধু বোঝান হয়, তাও অনেকে মৃত-প্রায় হয়ে যায়। বাচ্চাদের এখানে লেখা-পড়া করতে হয়। বাবা হলেন প্রেমের সাগর অর্থাৎ পড়িয়ে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করান। এটাই হলো ভালোবাসা। বাবা যখন পড়ান তখন পড়ে অন্যদেরকেও পড়াতে হবে। বাবাকে খুশী করতে হবে। বাবার সার্ভিসে সদা তৎপর থাকতে হবে। বাবার সার্ভিস এটাই যে নিজের তন, মন, ধন দ্বারা ভারতের সত্য সেবা কর। তোমাদের তো শক্তিশালী আওয়াজ দ্বারা বোঝান উচিৎ। সবাই এখানে নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়, রাজধানীতেও নম্বরের ক্রমানুসারেই হবে। টিচার বুঝে যান যে এ দৈবী রাজধানীতে কী নম্বর পাবে। সার্ভিস দ্বারা বুঝতে পারো, কে কে মুখ্য হবে। নিজেরাও বুঝতে পারে যে আমরা যদি বাবা-মাম্মার মতো সার্ভিস না করি তাহলে দাস-দাসীর পদ পাবো। পরে তোমরা সবাই সবকিছুই জানতে পারবে। যদি তোমরা শ্রীমত অনুসারে না চল তাহলে সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই সময় তোমরা বাচ্চারা হলে স্টুডেন্ট, এখন যদি তোমরা নিজের দাসী বানাও তবে তোমাদেরও দাস-দাসী হতে হবে। এখানে মহারানী হওয়া হলো দেহ-অভিমান। সত্যি বলতে হবে যে বাবা এই ভুল হয়েছে। এখনো তো সবাই সম্পূর্ণ হয় নি। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তো লজ্জিত হতে হয়। বাবার রাত্রে মনের মধ্যে খেয়াল চলছিল যে, মানুষ ২১ জন্ম বলে, গায়নও করে, কিন্তু এখন এই ঈশ্বরীয় জন্ম হলো আলাদা। ৮ জন্ম সত্যযুগে, ১২ জন্ম ত্রেতায়, ২১ জন্ম দ্বাপরে, ৪২ জন্ম কলিযুগে। তোমাদের এই ঈশ্বরীয় জন্ম হলো সর্বাপেক্ষা উচ্চ জন্ম যা হলো অ্যাডপ্টেড(দত্তক নেওয়া)। একমাত্র তোমাদের ব্রাহ্মণেদেরই এই সৌভাগ্যশালী জন্ম হয়। আচ্ছা,

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্নেহ-স্মরণ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) প্রেমের সাগর বাবার ভালোবাসাকে রিটার্ন(ফেরত) করতে হবে। ভালো করে পড়ে তারপর পড়াতে হবে। শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে।

২) সততা আর স্বচ্ছতা দ্বারা প্রথমে নিজে ধারণাযুক্ত হয়ে তারপর অন্যদের ধারণা করাতে হবে। এক বাবার সঙ্গই করতে হবে।

বরদান :- পার্থিব সকল কিছুর থেকে ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে আপন ভাবের অনুভূতি করানো অনুভবের প্রতিমুর্ত ভব

ব্যাখ্যা:- যেমন প্রত্যেকের মন থেকে নির্গত হয় যে "আমার বাবা" । এমনই যেন সকলের মন থেকে বেরোয় যে ইনি আমার বেহদের ভাই বা বোন, দিদি বা দাদী। যেখানেই থাকো যেন বেহদের সেবার নিমিত্তে রয়েছ । পার্থিব সকল কিছুর থেকে ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে বেহদের ভাবনা, বেহদের শ্রেষ্ঠ কামনা রাখতে হবে - এটাই হলো ফলো ফাদার করা। এখন এর প্রাক্টিক্যাল অনুভব করো এবং করাও। এছাড়াও অনুভাবী গুরুজনেদের পিতা জী, কাকা জী বলা হয়। এমন বেহদের অনুভাবী অর্থাৎ সবার আপনজন, এমন যেন অনুভব হয়।

স্লোগান :- উপরাম স্থিতির দ্বারা উড়তী কলায় উড়তে থাকো তাহলে কর্ম-রূপী ডাল-পালার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যাবে না ।

"শাখা-প্রশাখার বন্ধনে আবদ্ধ হবে না"

মাতেশ্বরী জী-র মধুর মহাবাক্য- "মানুষের ৮৪ জন্ম হয়, ৮৪ লক্ষ যোনী নয়"

এখন এই যে আমরা বাচ্চারা বলি, প্রভু আমাদের ঐ পারে নিয়ে চলো - তো ঐ পারের অর্থ কী? লোকেরা মনে করে যে ঐপারের অর্থ হলো জন্ম-মৃত্যুর চক্র-তে না আসা অর্থাৎ মুক্ত হয়ে যাওয়া। এখন এতো হলো মানুষের কথা, কিন্তু তিনি বলেন, বাচ্চারা, যেখানে সত্যিই সুখ-শান্তি আছে, দুঃখ - অশান্তির থেকে দূরে - তাকে কোনো দুনিয়া বলে না। মানুষ সুখ চায় তাও তা আবার এই জীবনেই চায়। এখন সে তো সত্যযুগী বৈকুন্ঠ, দেবতাদের দুনিয়া ছিল যেখানে সর্বদাই সুখময় জীবন ছিল, সেই দেবতাদের-কেই অমর বলা হতো। এখন অমরের-ও কোনো অর্থ নেই, এমনও নয় দেবতাদের আয়ু এতো বেশী ছিল যে কখনো মারা যেতো না। এখন এটা বলা তাদের ভুল কারণ এরকম হয় না। তাঁদের আয়ু সত্যযুগ-ত্রেতা পর্যন্ত চলে না। কিন্তু দেবী-দেবতাদের জন্ম সত্যযুগ-ত্রেতায় অনেকবার হয়েছে, ২১ জন্ম তাঁরা ভালোই রাজত্ব চালিয়েছে। তারপর আবার ৬৩ জন্ম দ্বাপর থেকে কলিযুগ পর্যন্ত অবতরণ (পতন) কলায় ; তাঁদের টোটাল জন্ম হলো, ২১ জন্ম চড়তী কলার আর অবনতি কলার ৬৩ জন্ম। টোটাল মানুষ ৮৪ জন্ম নেয়। কিন্তু এই যে মানুষ মনে করে যে মানুষ ৮৪ লক্ষ যোনী ভোগ করে, এমন বলা ভুল। যদি মানুষ নিজের যোনীতে সুখ-দুঃখ উভয় পার্ট-ই ভোগ করতে পারে তবে পশু-যোনীতে ভোগ করার প্রয়োজন আছে কী? এখন মানুষের এই নলেজই নেই, মানুষ ৮৪ জন্ম নেয়। এছাড়া টোটাল এই সৃষ্টিতে জন্তু জানোয়ার, পশু, পাখী ইত্যাদি সব মিলিয়ে অবশ্যই ৮৪ লক্ষ যোনী আছে। যেমন অনেক প্রজাতির জীব-জন্তু আছে, তার মধ্যেও মানুষ তার নিজের যোনীতেই পাপ-পূণ্য ভোগ করছে আর পশু তার নিজের যোনীতে ভোগ করছে। না মানুষ পশু-যোনীতে যায়, না পশু মনুষ্যযোনীতে আসে। মানুষ তো নিজের যোনীতেই (জন্মতে) দুর্ভোগ ভোগ করে, তখন তাদের দুঃখ-সুখের অনুভব আসে। তেমনই পশুরাও তাদের নিজের যোনীতে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু তাদের এই বোঝার বুদ্ধি নেই যে কোন্ কর্মের ফলে তাদের এই ভোগান্তি হয়। ভোগের অনুভবও মানুষই করে কারণ মানুষ বুদ্ধিমান। এছাড়া এমন নয় যে মানুষ ৮৪ লক্ষ যোনী ভোগ করে। অচেতন গাছ-পালাও আপন যোনীতে আসে। এ তো সহজ আর বিবেক-বুদ্ধির কথা যে অচেতন গাছ-পালা কী এমন কর্ম-অকর্ম করেছে যে তাদের হিসাব-কিতাব তৈরী হবে। যেমন দ্যাখো গুরুনানক সাহেব এমন মহাবাক্য উচ্চারণ করেছেন -

অন্তিমকালে যে ব্যক্তি পুত্রকে স্মরণ করতে করতে মারা যাবে সে শুয়োরের যোনীতে আসে.....কিন্তু এ কথার অর্থ এটা নয় যে মানুষ শুয়োরের যোনীতে আসবে। কিন্তু শুয়োরের অর্থ হলো এই যে মানুষের কাজ-কর্মই এমন হয়ে যায়, পশুর কাজ-কর্মের মতো । এছাড়া এমন নয় যে মানুষ পশু হয়ে যায়। এখন এ তো মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য এমন শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহলে সঙ্গমের এই সময় নিজেকে পরিবর্তন করে পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মা হতে হবে। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।